জামায়াতে ইসলামীর ইতিকথা

এ কে এম নাজির আহমদ

জামায়াতে ইসলামীর ইতিকথা

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

জামায়াতে ইসলামীর ইতিকথা

– এ. কে. এম. নাজির আহমদ

প্রকাশক	:	**আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম** চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৫, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	মে - ২০২৩ জ্যৈষ্ঠ - ১৪৩০ শাওয়াল - ১৪৪৪
নির্ধারিত মূল্য	:	২২.০০ (বাইশ) টাকা মাত্র।
মুদ্রণে	:	আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস ৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

***Jamaate Islami'r Etikatha**, Written by AKM Nazir **Ahmad**, Published by : Abu Taher Mohammad Masum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.*

Fixed Price : 22.00 (Twenty two.) taka only.

প্রারম্ভিক কথা

বর্তমান সময়ের ইসলামী আন্দোলনগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে অতীব মর্যাদাপূর্ণ একটি অবস্থান।

চিন্তার বিশুদ্ধি সাধন, চরিত্র গঠন, সাংগঠনিক শক্তি সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা জামায়াতে ইসলামীকে অনন্য সংগঠনে পরিণত করেছে।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে জামায়াতে ইসলামী বর্তমান মানজিলে পৌঁছেছে। জামায়াতে ইসলামীর কাজ বহুমাত্রিক। বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এই সংগঠনকে ভিত্তি করে। ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হতে থাকবে।

এ কালের পাঠকদের অন্যতম বড় অভাব হচ্ছে সময়ের অভাব। অথচ জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি বিশিষ্ট সংগঠনের ইতিহাস, সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের জানা থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রাথমিক অবগতির একটি পুস্তিকা হিসেবে এ লেখাটি আমি তৈরি করেছি। জামায়াতে ইসলামীর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বড়ো বড়ো কিছু অবদানকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি, এ থেকে নতুন প্রজন্ম জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে প্রাথমিক অবগতি লাভ করতে সক্ষম হবেন এবং অন্যান্য বই পড়ে জামায়াতে ইসলামীর বিস্তারিত ইতিহাস জানতে আগ্রহী হবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন !

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

—— সূচিপত্র ——

১।	কলম সৈনিক সাইয়েদ মওদূদী (রাহি.)	০৭
২।	জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বিরাগভাজন সাইয়েদ মওদূদী (রাহি.)	০৮
৩।	মুসলিম লীগের সাথে সাইয়েদ মওদূদীর মত-পার্থক্য	১০
৪।	জামায়াতে ইসলামী গঠন	১২
৫।	জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান	১৪
৬।	ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	১৪
৭।	ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর কাজের সূচনা	১৫
৮।	ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন	১৬
৯।	কাদিয়ানীদের অ-মুসলিম ঘোষণার আন্দোলন	১৭
১০।	১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র	১৯
১১।	জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা	২০
১২।	জোটবদ্ধ রাজনীতি	২২
১৩।	১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধ	২৪
১৪।	আবার জোটবদ্ধ রাজনীতি	২৬
১৫।	উগ্রপন্থীদের অপ-রাজনীতির পরিণতি	২৯
১৬।	১৯৭০ সনের নির্বাচন	২৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামায়াতে ইসলামীর ইতিকথা

১। কলম সৈনিক সাইয়েদ মওদূদী (রাহি.)

ক) ১৯১৮ সনে বিজনৌর থেকে প্রকাশিত "মাদীনা" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন সম্পাদকীয় ষ্টাফের একজন। তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর।

খ) ১৯১৮ সনে জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক তাজ" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

গ) ১৯২১ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা মুফতী কিফায়েতুল্লাহ এবং মাওলানা আহমাদ সায়ীদের উদ্যোগে "মুসলিম" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক পদে নিযুক্তি লাভ করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

ঘ) ১৯২৫ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ "আল জমিয়ত" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করে।

সম্পাদক নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৯২৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের "এক জাতি তত্ত্বের" প্রতি সমর্থন ঘোষণা করলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

ঙ) ১৯৩২ সনে আবু মুহাম্মাদ মুসলিহ নামক একজন দ্বীনদার ব্যক্তি হায়দারাবাদ থেকে "তারজুমানুল কুরআন" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা শুরু কনে। সম্পাদক নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

কিছুকাল পর পত্রিকাটির মালিকানাও তাঁর (মওদূদী) হাতে তুলে দেয়া হয়। প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাইয়েদ মওদূদী লিখেন, "এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা এবং মানুষকে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো।

বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল কুরআনের নিরিখে দুনিয়ায় বিস্তারশীল চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির নীতিমালার ওপর মন্তব্য করা, বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর নীতিগুলো ব্যাখ্যা করা এবং যুগের প্রেক্ষাপটে আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর বিধানগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি নির্দেশ করা। এই পত্রিকা মুসলিমদের এক নতুন জীবনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে।"

চ) তখন সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশের মুসলিমদের আদর্শিক অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য বুঝার যোগ্যতা ছিলো না তাদের অনেকেরই। ইসলামী জীবন দর্শন এবং ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা তাদেরকে সহজেই বিপথগামী করে চলছিলো।

এই অমানিশায় মাসিক তারজুমানুল কুরআনে ইসলামের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে লিখে চলছিলেন যুবক ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। আদর্শিক জ্ঞান বিতরণের সাথে সাথে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনামূলক লেখাও তিনি লিখে চলছিলেন।

২। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বিরাগভাজন সাইয়েদ মওদূদী (রাহি.)

ক) জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "আল জমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জমিয়ত নেতৃবৃন্দের বিরাগভাজন হন।

খ) ১৯৩৭ সনের নভেম্বর মাসে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী লাহোর শাহী মাসজিদে প্রদত্ত এক ভাষণে খুবই জোরালো ভাষায় অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের "একজাতি

তন্ত্রের" প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তাঁর এই ভাষণ পরবর্তী সময়ে "মুত্তাহিদা কাউমিয়াত আওর ইসলাম" নামে প্রকাশিত হয়।

সাইয়েদ মওদূদী শারাফাত বজায় রেখেই আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর নিরিখে এই বক্তব্য খণ্ডন করে মাসিক তারজুমানুল কুরআনে নিবন্ধ লিখতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে এই নিবন্ধগুলো "মাসলায়ে কাউমিয়াত" নামে মুদ্রিত হয়। [বাংলা অনুবাদ "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ"]

এই লেখালেখির ফলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.) জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আরো বিরাগভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন।

গ) কাউমিয়াত বিষয়ে সাইয়েদ মওদূদী (রাহি.) লিখেন, "ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোনো কারণ নয়। এটা করা হয় অধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয়েছে যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়-মনের পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও দ্বীন অনুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা এই আহ্বান গ্রহণ করবে তারা এক জাতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা অগ্রাহ্য করবে, তারা ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি। তার ব্যষ্টি-সমষ্টি মিলে একটি উম্মত। মানুষের অপরটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তারা পারস্পরিক মতবিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল।"

ইসলামী জাতীয়তা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

"বন্ধুত্ব আর শত্রুতা এ কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এ স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, শাসন ব্যবস্থা কোনো সূত্র ও কোনো আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

"উল্লেখ্য যে, অমুসলিম জাতিগুলোর সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দুইটি দিক রয়েছে।

প্রথমটি হলো, মানুষ হিসেবে মুসলিম অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলিমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, ঔদার্য এবং সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। কারণ মানবতার নিরিখে এরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমনকি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি এবং মিলিত উদ্দেশ্যের (common cause) জন্য সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদের ও আমাদেরকে মিলিত করে 'এক জাতি' বানিয়ে দিতে পারে না।"

দ্রষ্টব্য : ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

উল্লেখ্য, কংগ্রেসের "এক জাতি তত্ত্বের" মোকাবিলায় মুসলিম লীগ সাইয়েদ মওদূদীর পুস্তিকাটি সারা দেশে বিপুল সংখ্যায় বিতরণ করে।

৩। মুসলিম লীগের সাথে সাইয়েদ মওদূদীর মত-পার্থক্য

১৯৪০ সনের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগ "পাকিস্তান" নামে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

মুসলিম লীগ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ ধারণা দিচ্ছিলো যে, পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে সাইয়েদ মওদূদী (রাহি.) মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেন। দুঃখের বিষয়, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ মৌলিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হন।

এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সনের ১২ সেপ্টেম্বর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচি হলে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় সাইয়েদ মওদূদী এক জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ দেন।

এ ভাষণের বিষয় ছিলো : "ইসলামী হুকুমাত কিস্ তারাহ কায়েম হোতি হায়।" [এই ভাষণেরই বাংলা অনুবাদ "ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় "।]

এ ভাষণের একাংশে তিনি বলেন, "অলৌকিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি আন্দোলন

উত্থিত হওয়া অপরিহার্য যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদণ্ড এবং সেই চারিত্রিক আদর্শের ওপর যা হবে ইসলামের প্রাণ শক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেইসব লোকই এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হওয়ার যোগ্য যারা এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদের গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবে এবং সেই সাথে সমাজে অনুরূপ মন-মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তির প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন সব লোকের যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে, যারা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ ক্ষতি পার্থিব লাভ-ক্ষতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যারা সর্বাবস্থায় সেইসব আইন-কানুন, বিধি-বিধান এবং কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে যা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। যাদের চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব ও কামনা বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত যাদের গর্দান। হিংসা-বিদ্বেষ ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হওয়ার নয়। অর্থ-সম্পদের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার হাতে এলেও যারা নিখাদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ-চিন্তায় যারা না ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে নিজেদের জান-মাল-ইজ্জতসহ যাবতীয় বিষয়ে থাকবে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন একদল লোকের যারা কোনো দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদ ধ্বংস সাধন, জুলুম-নির্যাতন, গুণ্ডামি, বদমায়েসী ও ব্যভিচারের ভয়ে ভীত হবে না। বরং বিজিত দেশের মানুষেরা তাদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জান-মাল-

ইজ্জতের ও তাদের নারীদের সতীত্বের হিফাজাতকারী রূপে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হবে যে তাদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক-চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে গোটা দুনিয়া তাদের প্রতি হবে আস্থাশীল। এ ধরনের, কেবলমাত্র এ ধরনের লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ইসলামী রাষ্ট্র।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবে বলে অংগীকার করেছিলো। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম-কৌশল গ্রহণ করতে মুসলিম লীগের অনাগ্রহ ছিলো নি:সন্দেহে দু:খজনক।

৪। জামায়াতে ইসলামী গঠন

ক) সাইয়েদ মওদূদী একটি সত্যনিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মাসিক তারজুমানুল কুরআনে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের একটি সম্মেলনে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানান।

খ) ১৯৪১ সনের ২৫ ও ২৬ অগাস্ট লাহোরে মাসিক তারজুমানুল কুরআন অফিসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ অগাস্ট ৭৫ জন লোক নিয়ে গঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী। এই ৭৫ জন সদস্য সাইয়েদ মওদূদীর উপস্থাপিত একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া অনুমোদন করেন। অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, এই সময় সাইয়েদ মওদূদীর বয়স ছিলো ৩৮ বছর।

গ) সম্মেলনের এক পর্যায়ে ৭৫ জন সদস্যের সামনে প্রদত্ত ভাষণের একাংশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "জামায়াতে ইসলামীতে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদেরকে এই কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, জামায়াতে ইসলামীর সামনে যে কাজ রয়েছে তা কোনো সাধারণ কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতি-নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি,

সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি-সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। দুনিয়ায় আল্লাহ-দ্রোহীতার ওপর যে ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তা বদলিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর কায়েম করতে হবে। সকল শাইতানী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম।"

লক্ষ্যণীয়, মাত্র ৭৫ জন সদস্যের সামনে দাঁড়িয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা পাল্টে দেবার" সংকল্প ব্যক্ত করেন।

নিশ্চয়ই সেইদিন অনেকে এই বক্তব্যকে অবাস্তব কল্পনা বিলাস বলে বিদ্রুপ করে থাকেন।

কিন্তু সাইয়েদ মওদূদী জানতেন, পৃথিবীর প্রতিটি বিপ্লবের গোড়াতে গুটি কতেক লোকই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করেছে অগণিত মানুষকে।

ঘ) উল্লেখ্য, ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সাইয়েদ মওদূদী তাঁর অনবদ্য তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন" লেখা শুরু করেন যা ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্য অন্যতম অতীব উত্তম পাথেয়।

ঙ) আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ সনে তাঁরই প্রস্তাব অনুমোদন করে জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরা ছাত্র অঙ্গনে কাজ করার জন্য পৃথক ছাত্র সংগঠন কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সনের ২৩ ডিসেম্বর 'ইসলামী জমিয়তে তালাবা' নামে এই ছাত্র সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে।

[১৯৫২ সনের শুরুতে এর শাখা গঠিত হয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৫৬ সন থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এই সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ নামে কাজ করতে থাকে।]

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা, তাফসীর তাফহীমুল কুরআন লেখা এবং ইসলামী জমিয়তে তালাবা প্রতিষ্ঠা সাইয়েদ মওদূদীর অতি বড়ো তিনটি অবদান। ইসলামী রিভাইভ্যাল প্রয়াসে তিনটির ভূমিকাই অসাধারণ।

৫। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান

১৯৪৭ সনের ১৪ ও ১৫ অগাস্টের মধ্যবর্তী রাতে দিল্লিতে বসে বৃটিশ শাসিত উপ-মহাদেশের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তখন জামায়াতে ইসলামীর রুকন ছিলো ৬২৫ জন। দেশ ভাগ হলে জামায়াতে ইসলামীও ভাগ হয়।

মোট ২৪০ জন রুকন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ এবং ৩৮৫ জন রুকন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে।

৬। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

পাকিস্তান অর্জনের পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আন্দোলন চলাকালীন অঙ্গীকার বেমালুম ভুলে যান।

তাঁরা আলোচনা শুরু করেন পাকিস্তানের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেম, না আমেরিকান প্রেসিডেনশ্যাল সিস্টেম উপযোগী হবে তা নিয়ে।

ক) ১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে ল' কলেজ, লাহোরে এক আলোচনা সভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "ইসলামী আইন" সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

খ) ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ল' কলেজ, লাহোরে অনুষ্ঠিত আরেকটি আলোচনা সভায় সাইয়েদ মওদূদী "ইসলামী আইন প্রবর্তনের উপায়" সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, ইসলামী আইন রাতারাতি প্রবর্তন করা যাবে না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা প্রবর্তন করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদকে ঘোষণা করতে হবে :

❖ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।

❖ ইসলামী শরিয়া হবে দেশের মৌলিক আইন।

❖ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল করা হবে।

- ❖ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই শরিয়ার সীমালংঘন করবে না।

গ) ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উক্ত দফাগুলোর ভিত্তিতে "আদর্শ প্রস্তাব" (Objectives Resolution) গ্রহণ করার জন্য গণপরিষদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

এইভাবে শুরু হয় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

উল্লেখ্য যে :

- ❖ পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো ইসলামের নামে।
- ❖ মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ইসলামী জযবা তখনো ছিলো তরতাজা।
- ❖ গণপরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য পেশ করার মতো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন।
- ❖ সার্বিক বিবেচনায় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা ছিলো সময়ের দাবি।

ঘ) সরকার ইসলামী শাসনতন্ত্রের আওয়াজটি গোড়াতেই স্তব্ধ করে দিতে চায়।

তাই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ইন্তিকালের (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) ২২ দিন পর ১৯৪৮ সনের ৪ অক্টোবর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং আরো কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাকে জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। অবশ্য ১৯৫০ সনের ২৮ মে, প্রায় বিশ মাস জেলে থাকার পর, তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।

৭। ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর কাজের সূচনা

ক) ১৯৪৮ সনে কেন্দ্র থেকে রফী আহমাদ ইন্দোরী ঢাকাতে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু করার জন্য প্রেরিত হন। ঢাকা আলীয়া মাদরাসার শিক্ষক ক্বারী জলীল আশরাফ নদভী, অন্য এক চাকরিজীবী খুরশীদ আহমাদ বাট এবং বরিশাল থেকে ডেকে আনা মাওলানা আবদুর রহীমকে নিয়ে রফী আহমাদ ইন্দোরী ঢাকাতে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আবদুর রহীম কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় লেখাপড়া কালে সাইয়েদ আবুল আ'লার সাহিত্য অধ্যয়ন করে জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক সদস্য হয়েছিলেন।

খ) এভাবে মাত্র চার জন ব্যক্তি নিয়ে ঢাকাতে জামায়াতে ইসলামীর গোড়া পত্তন হয়।

৮। ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন

মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ইন্তিকালের পর গভর্নর জেনারেল হন খাজা নাজিমুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন লিয়াকত আলী খান।

১৯৫০ সনের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যে, দেশের আলিম সমাজ যদি সর্বসম্মতভাবে কোনো শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থাপন করে গণপরিষদ তা বিবেচনা করে দেখবে।

প্রধানমন্ত্রী আস্থাশীল ছিলেন যে, দেশের বহুধা বিভক্ত আলিম সমাজ এ জটিল বিষয়ে কখনো একমত হতে পারবে না এবং কোনো সর্বসম্মত প্রস্তাবও পেশ করতে পারবে না।

১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় দেশের সেরা আলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তৈরি হয় একটি মূল্যবান দলীল "ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি।"

২২ দফা :

১। দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
২। দেশের আইন আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হবে।
৩। রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ওপর সংস্থাপিত হবে।
৪। রাষ্ট্র মা'রূফ প্রতিষ্ঠা করবে ও মুনকার উচ্ছেদ করবে।
৫। রাষ্ট্র মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য-সম্পর্ক মজবুত করবে।
৬। রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দেবে।
৭। রাষ্ট্র শরিয়ার নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করবে।
৮। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

৯। স্বীকৃত মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পরিপূর্ণ দ্বীনি স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০। অমুসলিম নাগরিকরা আইনের আওতায় পার্সোনাল ল' ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১১। রাষ্ট্র শরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত অ-মুসলিমদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।

১২। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।

১৩। রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৪। রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি মজলিসে শূরা থাকবে।

১৫। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনতন্ত্র সাসপেণ্ড করতে পারবেন না।

১৬। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপ্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।

১৭। রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের উর্ধ্বে হবেন না।

১৮। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।

১৯। সরকারি ও প্রাইভেট সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবেন।

২০। ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।

২১। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।

২২। আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যে কোনো ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, এই নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)।

৯। কাদিয়ানীদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণার আন্দোলন

ইতোমধ্যে কাদিয়ানী ইস্যুটি সামনে আসে।

ক) ১৯৫৩ সনের জানুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, মজলিসে আহরার, জমিয়তে আহলে হাদিস, মুসলিম লীগ, আনজুমানে তাহাফফুজে হুকুকে শিয়া প্রভৃতি দল করাচীতে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়।

জামায়াতে ইসলামী প্রস্তাব করে যে কাদিয়ানী ইস্যুটিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়া হোক।

খ) ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কাদিয়ানী ইস্যু নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য করাচীতে সর্বদলীয় নির্বাহী পরিষদের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এ মিটিংয়ে অন্য দলগুলো সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের সিদ্ধান্ত নেয়।

জন্মলগ্ন থেকেই জামায়াতে ইসলামী শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। অতএব জামায়াতে ইসলামী সর্বদলীয় মোর্চার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে।

অন্যরা ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু করে। পাঞ্জাবে পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এ জন্য অবশ্য পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানার ভূমিকাই ছিলো প্রধান।

গ) ১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে লাহোরে মার্শাল ল' জারি করা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

ঘ) ১৯৫৩ সনের ২৮ মার্চ মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মিয়া তোফাইল মুহাম্মাদ, মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয, চৌধুরী মুহাম্মাদ আকবার এবং সাইয়েদ নকী আলীকে গ্রেফতার করে।

ঙ) ১৯৫৩ সনের ৮ মে "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক পুস্তকের মাধ্যমে জনগণের মাঝে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মিথ্যা অভিযোগ এনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়।

দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়। যার ফলে সরকার মৃত্যুদণ্ড রহিত করে সাইয়েদ মওদূদীর চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের কথা ঘোষণা করে।

অবশ্য দুই বছর একমাস জেল খাটার পর (১৯৫৫ সনের ২৯ এপ্রিল) তিনি মুক্তি লাভ করেন।

চ) জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাকে মেরে ফেলার এ চক্রান্তের আসল লক্ষ্য ছিলো ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের বলিষ্ঠতম কণ্ঠটিকে স্তব্ধ করে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে।

১০। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র

ক) ১৯৫৬ সনের ২৯ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়। স্থির হয় ঐ সনেরই ২৩ মার্চ থেকে এটি কার্যকর হবে।

খ) ১৯৫৬ সনের ২৯ মার্চ পাকিস্তানের তৃতীয় গভর্নর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদকে অব্যাহতি দিয়ে "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান" এর প্রথম প্রেসিডেন্ট বানানো হয় মেজর জেনারেল ইসকান্দার আলী মীর্যাকে।

গ) ১৯৫৬ সনে গৃহীত শাসনতন্ত্রটি সামগ্রিক বিবেচনায় একটি ভালো শাসনতন্ত্র ছিলো। এতে ইসলামী চিন্তা-চেতনারও যথেষ্ট রিফ্লেকশন ছিলো। তবে এই শাসনতন্ত্র না ছিলো পুরোপুরি "প্রেসিডেনশ্যাল", না ছিলো পুরোপুরি "পার্লামেন্টারি"।

ফলে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না থাকলে ক্ষমতা নিয়ে টাগ-অব-ওয়ারের সুযোগ ছিলো। ইসকান্দার আলী মীর্যা এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি সরকার ভাঙ্গা ও গড়ার খেলায় মেতে ওঠেন।

ঘ) ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯ আসনের মধ্যে ৩০০টি আসনে বিজয়ী হয়। ৯টি আসনে বিজয়ী হয় মুসলিম লীগ।

[উল্লেখ্য, যুক্ত ফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী এবং হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।]

কিন্তু যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর আন্তকলহের ফলে প্রাদেশিক সরকার ভাঙ্গা ও গড়া চলতে থাকে।

ঙ) ১৯৫৮ সনের ২০ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান সরকারের প্রতি আস্থা ভোটের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসে।

এ অধিবেশনে স্পীকার আবদুল হামীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী স্পীকারের দায়িত্ব পান। পরিষদে হট্টগোল চলতে থাকে। উত্তেজিত

সদস্যদের আঘাতে শাহেদ আলী পাটোয়ারী মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন।

চ) ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদগুলো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলো ভেঙ্গে দেন। প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন সেনাপ্রধান জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান। ২৭ অক্টোবর আইউব খান প্রেসিডেন্ট পদ দখল করেন।

এভাবে ৯ (নয়) বছরের চেষ্টা সাধনার ফসল ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রটি পরিত্যক্ত হয় এবং পাকিস্তানে জেঁকে বসে অনভিপ্রেত সামরিক শাসন।

১১। জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা

ক) ১৯৬২ সনের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান দেশের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র জারি করেন। এটি না ছিলো ইসলামিক, না ছিলো গণতান্ত্রিক। এতে বিধান রাখা হয় দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ মৌলিক গণতন্ত্রীদের (Basic Democrats) দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

আর মৌলিক গণতন্ত্রী হবেন পূর্ব পাকিস্তানের ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মিলে ৪০ হাজার জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মিলে ৪০ হাজার জন। অর্থাৎ মোট ৮০ হাজার ব্যক্তি ছাড়া দেশের কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হয়।

খ) ১৯৬২ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

১৯৬১ সনের ২ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান "মুসলিম পারিবারিক আইন" অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন। সামরিক শাসন থাকাসত্ত্বেও সাইয়েদ আবুল আ'লা সেই অর্ডিন্যান্সের কড়া সমালোচনা করেন। এবার তিনি মাঠে নামেন আইউব খানের

জারি করা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে। ফলে আইউব খান সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ভীষণ চটে যান।

গ) ১৯৬৩ সনের ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলন। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার ভালো কোনো স্থানের অনুমতি দেয়নি। সম্মেলনে ব্যবহারের জন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে সম্মেলন পণ্ড করার সরকারি প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। এতে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ক্রোধের মাত্রা আরেকটু বাড়ে।

ঘ) ১৯৬৪ সনের ৪ জানুয়ারি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকার জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা করে।

আমীরে জামায়াতসহ মোট ৬০ জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। সরকার অভিযোগ করে যে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছে, কাশ্মীর জিহাদকে নাজায়েয মনে করে, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্যশীলতা বিনষ্ট করে, ছাত্রদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে।

জামায়াতে ইসলামী সরকারের বানোয়াট অভিযোগ ও বেআইনি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

মিঃ এ. কে. ব্রোহীর নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করে। পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট রিট খারিজ করে দেয়।

পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের অর্ডার বাতিল বলে ঘোষণা করে। এবার মামলা যায় সুপ্রিম কোর্টে।

ঙ) ১৯৬৪ সনের ৯ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১২। জোটবদ্ধ রাজনীতি

ক) ১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব খান শাসনতান্ত্রিক বৈধতা লাভের তাকিদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন।

খ) ১৯৬৪ সনে খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রচেষ্টায় আইউব খানের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে। এ জোটের নাম দেওয়া হয় "কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ" (COP)।

গ) ১৯৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ" ১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইউব খানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতিমা জিন্নাহকে নমিনেশন দেয়।

ঘ) এ সময় জামায়াতে ইসলামী ছিলো বেআইনি। নেতৃবৃন্দ ছিলেন জেলখানায়। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার যে কয়জন সদস্য মুক্ত ছিলেন তাঁরা পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম বলে খ্যাত মুফতী মুহাম্মাদ শফীর সাথে মত বিনিময় করেন।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী বলেন, "স্থায়ী রাষ্ট্র-প্রধান হিসেবে নয়, স্বৈরশাসক থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সম্মিলিত বিরোধী দলকে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলার সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সে উদ্দেশ্যে তাঁকে অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই বলে যদি আপনারা মনে করেন তা হলে এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন। কিন্তু স্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদ দেয়া যেতে পারে না।"

দ্রষ্টব্য : জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা, অধ্যাপক গোলাম আযম।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য যারা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরা ১৯৬৪ সনের ২রা অক্টোবর একটি মিটিংয়ে একত্রিত হন।

"আলোচনান্তে মজলিসে শূরা অভিমত ব্যক্ত করে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা সমীচীন নয়। কিন্তু দেশে চলছে এক অস্বাভাবিক অবস্থা। স্বৈরশাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে মিস ফাতিমা জিন্নাহর কোনো

বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় সার্বিক অবস্থার নিরিখে জামায়াতে ইসলামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহকেই সমর্থন করবে।"

১৯৬৪ সনের ৯ই অক্টোবর জামায়াত নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তি লাভ করে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

ঙ) প্রেসিডেন্ট আইউব খানের পক্ষে কয়েকজন পীর মাঠে নামেন। তাঁরা প্রচার করতে থাকেন যে, মাওলানা মওদূদী সুবিধা মতো তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

এ প্রচারণার পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "যারা অভিযোগ করেন, আমি সুবিধামতো আমার মত পরিবর্তন করি, তাঁদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা : ইসলাম কি একজন মহিলাকে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত বানাবার অনুমতি দেয় ? ইসলাম কি সহ-শিক্ষার অনুমতি দেয় ? ইসলাম কি পুরুষ ও মহিলাকে একই অফিসে পাশাপাশি বসে কাজ করার অনুমতি দেয় ? ইসলাম কি মহিলাদের এয়ার হোস্টেস হয়ে পুরুষদের মদ পরিবেশন করার অনুমতি দেয় ? এগুলো যদি নিষিদ্ধ হয় এতোকাল এসব বিষয়ে আপনারা কথা বলেননি কেন ? আপনারা শুধু একজন মহিলার রাষ্ট্রপ্রধান পদপ্রার্থী হওয়ার বিষয়ে ইসলামের ব্যাপারে জাগলেন কেন ?"

তিনি আরো বলেন, "এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে শরিয়ার নিরিখে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মহিলাদের নেই। কাজের এই ক্ষেত্রটি পুরুষদেরই। বর্তমান মুহূর্তে একজন মহিলা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন কি পারেন না তা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে এমন এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায় যিনি ইসলামী মূল্যবোধের অবনতির জন্য দায়ী। আইউব খানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাদের এমন এক ব্যক্তিকে প্রয়োজন যিনি জাতির শ্রদ্ধাভাজন। এ প্রেক্ষাপটে আমরা জাতির স্থপতির বোন মিস ফাতিমা জিন্নাহর চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয় আর কোনো ব্যক্তি দেখছিনা।

আমরা যদি মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে না দাঁড়াই তার অর্থ হয় আইউব খানকে সমর্থন করা। আমাদের দুইটি মন্দের একটি গ্রহণ করতে হবে : হয় আমাদের একজন মহিলাকে সমর্থন করতে হবে, নয়তো সমর্থন

করতে হবে একজন অত্যাচারীকে। একজন অত্যাচারীকে সমর্থন করার চেয়ে একজন মহিলাকে সমর্থন করা কম মন্দ। বর্তমান মুহূর্তের বিশেষ অবস্থায় (in the special circumstances) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন মহিলাকে সমর্থন করা যায়।"

চ) নির্বাচনে আইউব খান পান ৪৯,৬৪৭ ভোট। আর মিস ফাতিমা জিন্নাহ পান ২৮,৩৪৫ ভোট।

প্রেসিডেন্ট আইউব খানের চোখ রাঙানি ও নানামুখী চাপ উপেক্ষা করে ২৮ হাজারের বেশি মৌলিক গণতন্ত্রী মিস ফাতিমা জিন্নাহকে ভোট দেওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো দেশের রাজনৈতিক হাওয়া স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেই বইছে। আর এ হাওয়া সৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিলো খুবই বলিষ্ঠ।

১৩। ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধ

ক) ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই কাশ্মীরকে নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

খ) ১৯৬৫ সনের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সেই দিন রাওয়ালপিন্ডি ছিলেন। যুদ্ধের খবর শুনে তিনি লাহোর রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাঁকে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট আইউব খান তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চান।

গ) মাঝ পথ থেকে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করতে যান।

সেখানে পৌঁছে তিনি অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতা চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, চৌধুরী গোলাম আব্বাস এবং নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খানকে উপস্থিত দেখতে পান।

ঘ) উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট আইউব খান জামায়াতে ইসলামী এবং সাইয়েদ আবুল আ'লার প্রতি দারুণ বিদ্বেষ পোষণ করতেন। তাঁর কিছুসংখ্যক মন্ত্রী তো প্রায় প্রতিদিন জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেন।

প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রাদেশিক সরকারদ্বয় জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা করেছিলো এবং ৬০ জন কেন্দ্রীয় নেতাকে বন্দি করেছিলো।

কিন্তু জাতির কঠিন বিপদের সময় প্রেসিডেন্ট আইউব খান সাইয়েদ মওদূদীর সহযোগিতা চাইলে তিনি আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি ১৪, ১৬ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর রেডিও মারফত জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

ঙ) ১৯৬৫ সনের যুদ্ধ চলেছিলো ১৭ দিন। এ যুদ্ধে ভারতের সৈন্য সংখ্যা ছিলো পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যার ০৬ (ছয়) গুণ বেশি। তবুও ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানের যতোটুকু ভূমি দখল করেছিলো তার চারগুণ বেশি ভারতীয় ভূমি দখল করেছিলো পাকিস্তানী সৈন্যরা।

পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতের ১১০টি জঙ্গী বিমান ভূ-পাতিত করে। ভারতীয় সৈন্যরা ধ্বংস করে পাকিস্তানের ১৬টি জঙ্গী বিমান।

পাকিস্তানী নৌ-বাহিনী ভারতের দ্বারকা নৌ-ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে একটি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করে। কিন্তু ভারতীয় নৌ-বাহিনী পাকিস্তানের কোন নৌ-ঘাঁটির কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।

চ) প্রত্যক্ষ যুদ্ধে বিজয় লাভ করেও পাকিস্তান হেরে গেলো কূটনৈতিক যুদ্ধে।

১৯৬৬ সনের ১০ জানুয়ারি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি. কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে প্রেসিডেন্ট আইউব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত কৌশলে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হন আইউব খান। যে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ সে কাশ্মীরের কথা পর্যন্ত উল্লেখ ছিলো না সে চুক্তিতে।

ছ) ১৯৬৬ সনের ১৬ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মুহাম্মাদ হুসাইন চাত্তা, মালিক গোলাম জিলানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এক মিটিংয়ে একত্রিত হয়ে একটি যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে তাসখন্দ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৪। আবার জোটবদ্ধ রাজনীতি

ক) ১৯৬৬ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মকৌশল নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ লাহোরে এক মিটিংয়ে মিলিত হন।

এ মিটিংয়েই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর "ছয় দফার" কপি বিতরণ করেন। কিন্তু তিনি নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে "ছয় দফার" পক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াস চালাতে থাকেন।

খ) ১৯৬৭ সনের ৩০ এপ্রিল ঢাকাতে সর্বজনাব নুরুল আমীন, হামীদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, মুমতাজ মুহাম্মাদ খান, তোফাজ্জল আলী, খাজা খায়ের উদ্দীন, মিয়া তোফাইল মুহাম্মাদ, মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, আবদুস সালাম খান, গোলাম মুহাম্মাদ খান, চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, মৌলভি ফরিদ আহমদ ও এম.আর. খান এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন এবং "পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট" (PDM) নামে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করেন।

উল্লেখ্য, "পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট" প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান পরিচালিত অংশটি আলাদা থেকে "ছয় দফা" ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে থাকে। ১৯৬৮ সনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে সরকার "ছয় দফা" আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

গ) ১৯৬৮ সনের নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সনের জানুয়ারি মাসে এসে গোটা পাকিস্তানের শিক্ষা অঙ্গন ভীষণভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে।

ঘ) ১৯৬৯ সনের ৭ ও ৮ জানুয়ারি ঢাকাতে মিটিংয়ে একত্রিত হয়ে নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, পাকিস্তান

আওয়ামী লীগের (PDM পন্থী) সভাপতি নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফাইল মুহাম্মাদ, ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্টের সভাপতি নুরুল আমীন, মুসলিম লীগের সভাপতি মুমতাজ মুহাম্মাদ খান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (ছয় দফা পন্থী) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতী মাহমুদ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমীর শাহ গঠন করেন "ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি" (DAC)।

সকল রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দুর্বার আন্দোলনে পরিণত হয়।

লৌহ মানব আইউব খান স্পষ্ট দেখতে পান দেওয়ালের লিখন।

ঙ) ১৯৬৯ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব খান জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত রেডিও ভাষণে বলেন যে, যেহেতু জনগণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন চায় তিনি বিষয়টি নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করবেন। তিনি আরো ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিবতা করবেন না।

চ) ১৯৬৯ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। ঈদুল আজহার বিরতির পর ১০ মার্চ আবার কনফারেন্স শুরু হয়।

"ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির" আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, দুই মুদ্রা প্রচলন অথবা একই মুদ্রা রেখে প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন, দেশের পররাষ্ট্রনীতির নিরিখে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিগোশিয়েট করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে অর্পণ, কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে প্রদান, কেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলোর নিকট থেকে কর আদায়ের

ক্ষমতা দান, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও সাব-ফেডারেশন গঠন ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো ইসলামের নামে অথচ ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করা হয়নি। ফলে এই দেশ অসংখ্য সমস্যার দেশে পরিণত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা যদি প্রথমে মুসলিম ও পরে অন্য কিছু হতেন তাহলে সংখ্যা, সাম্য, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও আনুষঙ্গিক অন্য সব বিষয়ের উদ্ভব ঘটতো না। এমন কি ফেডারেল সরকার পদ্ধতিরও প্রয়োজন হতো না। ইসলামের জীবন পদ্ধতি কায়েম হলে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ সৃষ্ট সকল অন্যায়-অবিচার বিদূরিত হতো। শাসনতন্ত্রের কয়েকটি সংশোধনী আমাদের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না। প্রয়োজন আইনগত, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক- সামগ্রিক সংস্কার। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যই আমরা প্রথমে গণতন্ত্রের উত্তরণ চাই। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতা না থাকলে জনগণকে ইসলামের আলোকে শিক্ষা দান করা কঠিন। যেসব সমস্যা সমাজকে জর্জরিত করছে তার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। এ জন্য প্রথমে চাই প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন এবং ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন।"

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর "ছয় দফা" সমর্থন না করায় "ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির" সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ছ) ১৯৬৯ সনের ১৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স-এর সমাপ্তিকালে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন এবং ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন।

১৫। উগ্রপন্থীদের অপ-রাজনীতির পরিণতি

একতান্ত্রিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো দেশ। উগ্রপন্থীরা এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিনাশ করে দেয়।

দেশের সর্বত্র ঘেরাও আন্দোলন চলতে থাকে। চলতে থাকে জ্বালাও-পোড়াও অভিযান। হত্যা, আগুন লাগানো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়। সেক্রেটারিয়েটে হরতাল, ছাত্রদের হরতাল, শিক্ষকদের হরতাল ও শ্রমিকদের হরতাল চলতে থাকে। ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিবিদের ওপর হামলা চালানো হয়। আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটে। প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে। সর্বত্র ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দেশে কোনো সরকার আছে বলে মনে হচ্ছিলো না।

১৯৬৯ সনের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খানকে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

২৫ মার্চ সেনাপ্রধান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি শাসনতন্ত্র বাতিল করে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেঙ্গে দেন।

৩১ মার্চের এক ঘোষণা অনুযায়ী জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নেন।

১৬। ১৯৭০ সনের নির্বাচন

ক) জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে সাধারণ নির্বাচন না দিয়ে দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

১৯৭০ সনের ৩০ মার্চ তিনি ৪৮টি ধারা ও বহু উপধারা সম্বলিত "লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক" (আইন কাঠামো) জারি করেন। পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে উক্ত 'আইন কাঠামোতে নিম্নরূপ দিকনির্দেশনা ছিলো :

এক. পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র যার নাম হবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান।

দুই. পাকিস্তান সৃষ্টির বুনিয়াদ ইসলামী আদর্শ সংরক্ষিত থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম।

তিন. গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ফেডারেল ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

চার. আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বাধিক আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করতে পারে, আবার অন্যদিকে ফেডারেল সরকার যাতে আইন, প্রশাসন ও আর্থিক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়াবলী পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পাঁচ. পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের মানুষ জাতীয় সকল কর্মকাণ্ডে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং একটি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিকসহ সকল বৈষম্যের অবসান নিশ্চিত করতে হবে।

খ) ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর "ছয় দফা" আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়াতে থাকেন।

মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খান আবদুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মুজাফফার আহমদ "সমাজতন্ত্রের" পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো জোরেসোরে বলতে থাকেন যে, পাকিস্তানে "ইসলামী সমাজতন্ত্র" কায়েম করেত হবে।

পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা আবদুল হামীদ খান ভাসানী আওয়াজ তোলেন যে, পাকিস্তানে "ইসলামী সমাজতন্ত্র" কায়েম করতে হবে। মওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কট করে জনগণের উদ্দেশে বলতে থাকেন, "তোমরা যদি বাঁচতে চাও, হাতিয়ার হাতে তুলে নাও।"

সরদার আবদুল কাইউম খান, মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান প্রমুখ "মুসলিম জাতীয়তাবাদের" পতাকাবাহী রূপে প্রচার কাজ চালাতে থাকেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে "ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে" পরিণত করার লক্ষ্যে জনমত গঠন করার চেষ্টা চালাতে থাকে।

নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতা করেন। ১৯৭০ সনের ৩ নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করেন।

গ) ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। "পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি। আওয়ামী লীগের বাইরে নুরুল আমীন নির্বাচিত হন পিডিপি থেকে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রাজা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন।

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদের বরাদ্দকৃত ১৩১টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি পায় ৮৮টি আসন। সেখানে অন্য দলের মধ্যে কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭টি, কাইউম মুসলিম লীগ ৯টি, (মস্কোপন্থী) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৭টি, জমিয়তে উলামা ৭টি, জামায়াতে ইসলামী ৪টি, কনভেনশন মুসলিম লীগ ৭টি, মারকাযী জমিয়তে উলামা ৭টি ও স্বতন্ত্র সদস্যরা ১৭টি আসন লাভ করে।"

দ্রষ্টব্য : কালো পঁচিশের আগে ও পরে, আবুল আসাদ।

ঘ) এ নির্বাচনে একদিকে আবেগ, অন্য দিকে পেশি শক্তির বিরাট ভূমিকা ছিলো। তবুও এই কথা সত্য যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার আওয়ামী লীগের প্রতিই আস্থা স্থাপন করেছিলো।

এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খানের কর্তব্য ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের নেতা শেখ মুজিবুর

রজমানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা এবং তাঁর ওপর নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা।

কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতের ক্রীড়নক হয়ে তিনি সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার ফলে দেশ একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়।

এ যুদ্ধ ৯ (নয়) মাস স্থায়ী হয়। জান-মালের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয় এই যুদ্ধে। এ ৯ (নয়) মাসের বহুমাত্রিক ঘটনাবলী স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ঙ) ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার নিকট পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লে. জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

চ) নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আর এই নিষেধাজ্ঞা জামায়াতে ইসলামীর জন্যও প্রযোজ্য ছিলো।
এভাবে এ অঞ্চলে "জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান" এর কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমাপ্ত

জামায়াতে
ইসলামীর
ইতিকথা
এ কে এম নাজির আহমদ